মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ষষ্ঠ বর্ষ, দশম সংখ্যা, মার্চ ২০২৬

ট্রাস্টি স্থপতি রবিউল হুসাইন স্মরণ অনুষ্ঠান

নতুন প্রজন্মকে রবিউল হুসাইন সম্পর্কে জানাতে উদ্যোগী ভূমিকা নেয়ার আহবান

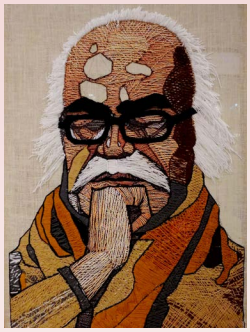

কবি স্থপতি রবিউল হুসাইন ছিলেন একজন সৎ, দেশপ্রেমিক, সাহসী কিন্তু অন্তর্জীবী একজন ঋষির গভীরতায় তিনি নিজেকে খোলা কবিতার মতো মেলে ধরতে পেরেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি রবিউল হুসাইন-এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যৌথভাবে আয়োজিত 'জীবন ও শিল্পচর্চায় কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন' শীর্ষক স্মরণ অনুষ্ঠানে স্থপতি ইনস্টিটিউটের সাবেক সাধারণ সম্পাদক স্থপতি কাজী এম আরিফ এভাবেই তাঁকে মূল্যায়ন করেন। তিনি আরও বলেন, ষাটের দশকে প্রথা বিরুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 'না' আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে আজও আমরা রবিউল ভাইকে স্মরণ করি। 'না' আন্দোলনে দৃঢ় থাকলেও সামাজিক-সাংস্কৃতিকসহ প্রগতিশীল সব আন্দোলনে রবিউল হুসাইন সবসময় ছিলেন হ্যাঁ এর পক্ষে। রবিউল হুসাইনকে একটি প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করে স্থপতি কাজী আরিফ বলেন, তাঁর সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে জানাতে স্থপতি ইনস্টিটিউট ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে।

স্থপতি তানজিম হাসান সেলিম বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণের সময় নকশা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন রবিউল ভাই আমাকে সাহস জুগিয়ে বললেন 'প্রতিটি সমস্যার একটি গুপ্ত সমাধান থাকে' এই কথাটা বুঝতে আমার অনেক সময় লেগেছে। এখনও যখন যেকোন সমস্যায় পড়ি তখন রবিউল ভাইকে স্মরণ করি।

৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা: ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ঘড়ির কাঁটা তখনও সকাল সাড়ে আটটা ছোঁয়নি, জাদুঘর প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে শিশু-কিশোরদের পদচারণায়। শত শত শিশুর ভাবনার রঙে মূর্ত হয়ে ওঠে দেশের স্বাধীনতা ও আত্মত্যাগের ছবি।

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু সাংবাদিক মার্ক টালি স্মরণানুষ্ঠান

৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধকালীন সাহসী সাংবাদিকতার জন্য বিশ্বব্যাপী পরিচিত বিবিসি সাংবাদিক মার্ক টালিকে স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক, একাত্তর টিভির বিশেষ প্রতিনিধি শাহনাজ শারমীন, বিবিসি বাংলার সাবেক প্রধান সাবির মুস্তাফা, প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন হাবীব।

'আমরা এখানে পক্ষ নেওয়ার জন্য আসিনি, কোনো আন্দোলন প্রচারের জন্য আসিনি। আমরা এখানে সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে এসেছি, যাতে মানুষ নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে।' ২০০৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত এক সেমিনারে মার্ক টালির ধারণকৃত বক্তব্যের ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তার বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার অভিজ্ঞতা ও সাংবাদিকতার মূলদর্শন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আরিচা ঘাট পার হয়ে গ্রামীণ এলাকায় গিয়ে কীভাবে প্রতিটি গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পলাশী ব্যারাকসহ বহু স্থানে ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি। শাখারী বাজারে ছবি তুলতে গিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পুলিশ তাঁকে আটক করে। এক বাঙালি অফিসার সাহসিকতার সঙ্গে তাঁকে মুক্ত করেন। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে বিবিসিকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু টালি দৃঢ়ভাবে উত্তর দেন 'আপনারা বলুন, আমরা কোন খবর মিথ্যা প্রচার করেছি।

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

লিবারেশন ডক কমিউনিটির সপ্তম আসর : ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

লিবারেশন ডক কমিউনিটির সপ্তম আসর অনুষ্ঠিত হলো গত ৭ ফেব্রুয়ারি, শনিবার বিকেল তিনটায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে। এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে এক বছর পূর্ণ করলো লিবারশেন ডক কমিউনিটি। আয়োজনের শুরুতেই ক্রোয়েশিয়ার শিল্পী এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা সারা জুরিনসিস (Sara Jurinčić) এর নিরীক্ষাধর্মী চলচ্চিত্র 'ভ্যালেরিজা' (Valerija) প্রদর্শিত হয়। মানুষের অতীত স্মৃতি কীভাবে তার শরীর-মনে বর্তমান রূপে হাজির থাকে, সেটা আলো-শব্দের মাধ্যমে নির্মাতা এই চলচ্চিত্রে তুলে ধরেছেন। কৌশল হিসেবে নির্মাতা স্টিল ইমেজ প্রজেক্টরের মাধ্যমে তার মুখাবয়বে প্রক্ষেপ করেন। এর ফলে এক ধরণের ইলিউশন তৈরি হয় যেখানে আমরা ইমেজগুলো নির্মাতার চেহারায় জীবন্ত হয়ে উঠতে দেখি। প্রদর্শনী শেষে চলচ্চিত্রের নানা দিক নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা তুলে ধরেন। নির্মাতা জুবায়ের রায়হান বলেন, চলচ্চিত্রটিতে অতীত এবং বর্তমানকে বোঝানোর জন্য দুটো আলাদা শব্দ জগত তৈরি করা হয়েছে। অতীতকে বোঝাতে আলাদা সাউন্ড এফেক্ট ব্যবহার করা হয়েছে। নির্মাতা পার্থ সেনগুপ্ত বলেন, নিরীক্ষাধর্মী চলচ্চিত্র, বিশেষ করে আর্কাইভ উপকরণ ব্যবহার করে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য আমাদের দেশের নির্মাতারা এখনো যথেষ্ট প্রস্তুত নয়।

এরপর 'স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের বিকল্প বিপণন' বিষয়ে আলোচনা করেন চলচ্চিত্র নির্মাতা ও কিউরেটর মেহেদী মুস্তফা। সুলতানার স্বপ্ন বিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থীদের নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোর সূত্র ধরে তিনি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিপণনের জন্য দীর্ঘ পরিকল্পনার কথা বলেন। তিনি বলেন যে, একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের পর সেটি চলচ্চিত্র উৎসবগুলোতে দেখানো ও বিপণনের জন্য দুইবছর মেয়াদ থাকে। সঠিক পরিকল্পনা থাকলে একটি চলচ্চিত্র মূলধারার মার্কেটের পাশাপাশি বিভিন্ন বিকল্প প্লাটফর্ম যেমন- বিশেষায়িত উৎসব, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের অনলাইন প্লাটফর্ম (Ops Doc, The New Yorker, Gardian, Yahoo Creation) এবং শিক্ষা ভিত্তিক প্লাটফর্মের মাধ্যমে নতুন নতুন দর্শকের কাছে পৌঁছাতে পারে। সেইসাথে চলচ্চিত্রের নির্মাণ খরচও সহজেই তুলে আনা যায়। লিবারেশন ডক কমিউনিটির পরবর্তী আয়োজনে ডকুমেন্টারি বিষয়ক আইডিয়া ও পরিকল্পনা জমা দেয়ার আহ্বান জানিয়ে আয়োজনটি শেষ হয়।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফিল্ম সেন্টার আয়োজিত বিভিন্ন কার্যক্রমে যারা নানাসময় আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয়েছেন বা ছিলেন তাদের চিন্তা ও চলমান কাজ সম্মিলিতভাবে উদযাপনের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকার প্লাটফর্ম হলো 'লিবারেশন ডক কমিউনিটি'।

ফরিদ আহমেদ
কোঅর্ডিনেটর, ফিল্মসেন্টার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাদুঘরের উন্মুক্ত চত্বর ও উন্মুক্ত মঞ্চের খোলামেলা পরিসরের চারপাশে তাদের আঁকা নানা ছবি ঝোলানো হয়েছে। শিশু-কিশোরেরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে ছবি আঁকে। শিশুদের ছবি আঁকার বিষয় ছিল উন্মুক্ত আর কিশোরদের বিষয় 'স্বাধীনতা'। চিত্রাঙ্কন শেষ হওয়ার পরপরই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় শিশু-কিশোরেরা গান, ছড়া ও কবিতায় মুগ্ধ করে রাখে দর্শকদের। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী আবুল বারাক আলভী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, চিত্রশিল্পী মনিরুজ্জামান, চিত্রশিল্পী অশোক কর্মকার এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের পরিবারের সদস্য অধ্যাপক ড. মাইনুল হক ও নাজনীন হক মিমি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, তোমরা হয়তো জানো না একাত্তরের পাঁচ বছর আগে পাকিস্তান আমলে এ দেশের বাঙালি যারা সামরিক বাহিনীতে ছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজন সাহসী মানুষ ও কয়েকজন বেসরকারি আমলা চিন্তা করেন যে যুদ্ধ করে দেশটা স্বাধীন করতে হবে। এই মানুষদের একজন ছিলেন সার্জেন্ট জহুরুল হক। পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে পড়লে শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাদের গ্রেফতার করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলা যখন চলছে তখন এই দেশের মানুষ ঊনসত্তর সালের জানুয়ারি মাসে গণঅভ্যুত্থান করেছিল। যে গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে অনেকেই মুক্তি পেলেও সার্জেন্ট জহুরুল হক মুক্তি পাননি। তিনি বন্দি দশায় ক্যান্টনমেন্টে নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে তাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়। এই মানুষটির স্মরণে তাদের পরিবারের সহায়তায় ২৭ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। কাজেই এটি কেবল ছবি আঁকা নয় বরং একজন দেশপ্রেমিক বীরকে সম্মান জানানো। তোমরা যদি তাঁকে সম্মান কর তবেই জাদুঘরের এই উদ্যোগ সফল হবে। শিল্পী মনিরুজ্জামান অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, শিশুদেরকে পড়াশুনার পাশাপাশি সত্যিকারের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি খেলার ছলে জানাতে হবে। শিল্পী অশোক কর্মকার বলেন, নিশ্চয় তোমরা জান সার্জেন্ট জহুরুল হক কে ছিলেন, কেন তার স্মরণে তোমরা ছবি আঁকলে। এই দেশের জন্য এই মাটির জন্য প্রথম যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম তিনি। তাঁকে আমরা সব সময় স্মরণ করব। এটা যদি আমাদের মাথায় থাকে তাহলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অর্জন কখনও বৃথা যাবে না। তোমরা ছবি আঁক, ছবি আঁকার ভিতর দিয়ে দেশকে ভালোবাসো, দেশের কথা বল, সুন্দরের কথা বল ও সত্য কথা বল। মুক্তিযোদ্ধা ও শিল্পী আবুল বারক আলভী বলেন, পুরস্কার তো সবাইকে একসাথে দেয়া সম্ভব না। কিন্তু মনযোগ দিয়ে ছবি আঁকলে দেখবে যে, আজকে এরটা ভালো হয়েছে তো কালকে ওরটা ভালো হবে, চেষ্টা যদি থাকে তাহলে ভালো হবেই হবে। তুমি যখন বাইরে যাবে সব কিছু মনযোগ দিয়ে দেখবে এবং কি আঁকবে তা নিজেই ঠিক করবে। সার্জেন্ট জহুরুল হকের পরিবারের সদস্য নাজনীন হক মিমি বলেন, এই ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের জন্য একটি গর্বের মাস। এই ফেব্রুয়ারি মাসে বর্বর পাকিস্তানিরা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নির্মমভাবে সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করে। তিনি সুন্দর ছবি আঁকতেন ও স্কাল্পচার বানাতেন। তিনি অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ জানান শুধু একাডেমিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই বড় না। একটি শিশুকে গড়ে তুলার জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি ছবি আঁকা, গান গাওয়া, নাচ করা ও সৃজনশীল কাজে আগ্রহী হয় সেই দিকে মনযোগ দেয়ার। তিনি অংশগ্রহণকারী প্রতিটি শিশুর বাবা-মাকে অভিনন্দন জানান। আলোচনার পর প্রতি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এবং পরিবারের পক্ষ থেকে উভয় বিভাগের পাঁচজনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী শিশুকেই সনদ ও বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। আনন্দঘন পরিবেশে সার্জেন্ট জহুরুল হক স্মরণে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটে।

রনিকা ইসলাম, কর্মসূচি কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

স্বপ্নের প্রদর্শনী : দিন বদলের অঙ্গীকার

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের 'সুলতানার স্বপ্ন' পড়ার পর শিশু-কিশোররা পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় সাজিয়ে তুলেছে প্রদর্শনী। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের খোলা মঞ্চের চারপাশের বোর্ডে দেখা যাচ্ছে তাদের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। তারা ছবি এঁকেছে– নানা ধরনের ছবি, কোথাও সুলতানা, কোথাও তার স্বপ্নে দেখা নারীস্থান, আবার কোথাও 'সুলতানার স্বপ্ন'র আলোকে শিল্পীর নিজস্ব ভাবনার নির্মাণ। বাণী, কবিতা, উদ্ধৃতি আর কল্পনার এই উপস্থাপন শেষ পর্যন্ত রূপ নিয়েছে সমাজে বিদ্যমান নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে এক শান্ত প্রতিবাদ ও ক্ষোভ হিসেবে। শুধু বিক্ষোভ নয় অসাম্য থেকে সমতায় ফেরার শপথ এবং প্রতিজ্ঞাও ফুটে উঠেছে প্রতিটি তুলি-কলমের টানে। লক্ষযোগ্য, এতে অংশ নিয়েছে বেশিরভাগ মেয়েরাই। ঘুরে ঘুরে যা চোখে পড়ে তা কিছুটা বিস্ময়কর। একান্ত আপন অনুভূতির এমন সরল প্রকাশ ঘটানোর সুযোগ সাধারণত পায় না শিশু-কিশোররা। তাই মনখোলা এসব অভিব্যক্তি প্রকাশের শিশুদের মুখে ফিরে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে– ওরাই বলেছে এসব!

ঈমান-সালিম লাইব্রেরির ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী বলেছে 'নারীরা চাইলে সবকিছু করতে পারে'। আর প্রদর্শনীতে প্রবেশের মুখে বাঁদিকে শিশু-কিশোর মেলা পাঠাগারের ১০ম শ্রেণির ছাত্রী রোকেয়াকে উল্লেখ করে লিখেছে 'তোমার স্বপ্নেই নারীরা আজ অগ্রগামী।'

প্রতিকূলতার মধ্যে নিরন্তর সংগ্রাম করে যাওয়া তাহমিনা ইকবাল পাবলিক লাইব্রেরির মেয়ে একজন অভিনেত্রীকে উদ্ধৃত করে বলেছে, 'আমি যত পোশাক পরি তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরটি হল আমার আত্মবিশ্বাস'।

রঙ, তুলির টান, কাঁচা হাতে সাজিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা এবং নিজের মনের কথা সবটুকু খুলে বলার যে ব্যাকুলতা, তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে এই প্রদর্শনীতে। এর নান্দনিকতার দিকটিও দৃষ্টিকাড়া। বিরুদ্ধ সময়ে সহস্র প্রতিরোধের মধ্যে ভস্মীভূত হতে হতে নারীর টিকে থাকার লড়াই বোঝাতে ব্রাইট স্কুল এন্ড কলেজের মেয়েরা তাদের লেখা কবিতা ও বাণীর কাগজ চারপাশে কিছুটা পুড়িয়ে উপস্থাপন করেছে বোর্ডে, স্পষ্ট করে তুলেছে নারীর প্রতি নির্যাতনে তাদের অন্তর্দহন! সানজিদা লিখেছে, 'স্বপ্নের পথে হাঁটতে গেলে বিদ্রুপ কিন্তু পথ বদলানো যাবে না। আজ তুচ্ছ কাল গৌরব, এটাই নিয়ম।' সুলতানার স্বপ্নে প্রভাবিত হয়ে এরাও স্বপ্ন দেখছে। নাম দিয়েছে স্বপ্নের বিজ্ঞান– '... ঘরটা ছিল গবেষণার ... কিন্তু শান্ত। কিছু নারী নতুন যন্ত্র বানাচ্ছিল। যন্ত্রটা শব্দ নয়, নীরবতা তৈরি করে। তারা বললো, এটা উগ্রতা থামায় ...।'

হাজারীবাগ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের মেয়েরাও নানা রঙের চিত্র এঁকে বুঝিয়েছে তাদের প্রতিবাদ। কাগজ কেটে রঙতুলি দিয়ে বানিয়েছে 'আমাদের স্বপ্ন' নামে খুব বড় এক চিত্র। লিখেছে 'আমরা নারী, আমরা সব পারি। আমরা নতুন স্বপ্ন গড়ি।' পাশে আলোকবর্তিকা গ্রন্থালয়ের ছেলেমেয়েরা ইচ্ছেডানা নির্মাণ করে বুঝিয়েছে নারীও স্বাধীন তাদেরও মনের সাধে আকাশে ওড়ার স্বাধীনতা দরকার। শৃঙ্খলিত হতে নয়, উড়তে চায় ভবিষ্যতের জন্য। লিখেছে, 'শিক্ষা পেলে নারীরাও পৃথিবী বদলে দিতে পারে।'

প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান। তার মধ্যে রয়েছে ঢাকার সোহাগ স্বপ্নধরা পাঠশালা, ইসলামী পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ পরিষদ, মুকুল ফৌজ পাঠাগার, শহীদ রুমী স্মৃতি পাঠাগার, দনিয়া পাঠাগার, কামাল স্মৃতি পাঠাগার, গ্রন্থবিতান, যাত্রাবাড়ি আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ এবং নীলফামারীর ইউনিক স্কুল ও ডোমার বহুমুখি উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জের পলশা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জের বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগার, পিরোজপুরের অরণি পাঠাগার, গাজীপুরের শুচি পাঠচক্র ও পাঠাগার, জামালপুরের ভাষা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মতিময়া ফাউন্ডেশন পাঠাগার, রংপুরের নুরলদীন স্মৃতি পাঠাগার এবং ডা. জমিল স্মৃতি পাঠাগার।

সত্যজিৎ রায় মজুমদার
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

সেরা প্রদর্শনীর পুরস্কার

'সুলতানার স্বপ্ন : শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল পাঠ' দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা যেমন পাঠ-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তেমনি ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ উৎসবে উপস্থাপন করে সৃজনশীল ভাবনার প্রতিফলন। পাঠাগার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থীরা বোর্ডে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের 'সুলতানার স্বপ্ন' পড়ার পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের খোলা চত্বরে সাজিয়ে তোলে প্রদর্শনী। তারা নানা ধরনের ছবি এবং কথায় 'সুলতানার স্বপ্ন'র আলোকে নিজস্ব ভাবনার উপস্থাপন করেছে স্বাধীনভাবে। প্রায় ৪৫টি পাঠাগার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরাসরি অংশগ্রহণ করে উৎসবে। প্রদর্শনীতে অংশ নেয় ২৩টি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে উপস্থাপনের বিষয়, নান্দনিকতা এবং মৌলিকত্বের বিবেচনায় তিনটি প্রতিষ্ঠানকে সেরা নির্বাচন করা হয়। কিন্তু প্রায় সবগুলো প্রতিষ্ঠানই সেরার পর্যায়ে উপস্থাপন করেছে। নির্বাচিত তিনটি হচ্ছে, ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত শিশু-কিশোর মেলা পাঠাগার, মিরপুরের আলোকবর্তিকা গ্রন্থালয় এবং হাজারীবাগ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ।

সেরাদের ৫ হাজার টাকা মূল্যের বই ক্রয়যোগ্য গিফট কার্ড প্রদান করেন সম্মানিত অতিথি বিশিষ্ট কবি মিনার মনসুর এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক। অনুষ্ঠানে সেরা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অনুভূতি ব্যক্ত করেন শিশু-কিশোর মেলা পাঠাগারের সভাপতি মর্জিনা খাতুন এবং আলোকবর্তিকা গ্রন্থালয়ের সভাপতি তুষার চন্দন।

স্মৃতিতে একাত্তরের শহিদ মো. রেজওয়ান আলী

জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ প্রাঙ্গণে গত ৫ ফেব্রুয়ারি আয়োজন করা হয় স্মৃতিচারণমূলক কর্মসূচির। মিরপুরস্থ টুইংক্যাল কিডস্ গ্রামার স্কুলের ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণির ৩৩ জন শিক্ষার্থী জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শন ও স্মৃতিচারণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। শহিদ মো. রেজওয়ান আলীর পুত্রবধূ মনোয়ারা বেগম মিনি শিক্ষার্থীদের সামনে তাঁর শ্বশুর কীভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত হন সেই স্মৃতিচারণ করেন। বিয়ের পর যা তিনি শাশুড়ি মফিজা খাতুন এবং স্বামী মেসের আলীর মুখে শুনেছিলেন। মো. রেজওয়ান আলী মিরপুর জনকল্যাণ সমিতির সদস্য ছিলেন এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর দুই ছেলে আশরাফ আলী ও মেসের আলীকেও জনকল্যাণকর কাজ করার উৎসাহ দিতেন। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের জনসভায় তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া তাঁরা মিরপুরে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের সদস্যও ছিলেন।

একাত্তরের ২২ মার্চ মিরপুর এলাকার পরিস্থিতি চরম উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠলে মো. রেজওয়ান আলী পরিবারের সবাইকে মিরপুরের মনিপুর এলাকায় রেখে আসেন। ২৩ মার্চ সকালে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনে অবস্থিত পানির ট্যাঙ্কের উপরে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং বিকেলে মিছিল বের করা হয়। এ সকল কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলেন মো. রেজওয়ান আলীর দুই ছেলে আশরাফ আলী ও মেসের আলী। স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের আরো কয়েকজন সদস্য ছিলেন ঐ মিছিলে। সেদিন বিহারিরা মিছিলে বোমাবাজি করে। এই ঘটনায় বিহারিদের অন্যতম টার্গেটে পরিণত হন মো. রেজওয়ান আলী ও তাঁর দুই ছেলে। এদিকে মার্চের ২২ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত মো. রেজওয়ান আলী প্রতিদিন বাসা থেকে মনিপুরে অবস্থানরত স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। ২৪ মার্চ সকালে তিনি যখন তাদের সাথে দেখা করে মিরপুরে ফিরছিলেন, তখন পরিবারের সবাই তাঁকে যেতে নিষেধ করেন। কিন্তু বাড়ি-ঘর দেখাশুনো করার জন্য তিনি সকল বাঁধা সত্ত্বেও মিরপুরে আসেন। মিরপুরের পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক দেখে ভয়ে মো. রেজওয়ান আলী-র স্ত্রী মফিজা খাতুন ২৫ মার্চ সকালে পরিবার নিয়ে হেঁটে জিঞ্জিরা গ্রামে এক বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং যুদ্ধের পুরো সময়টা তারা জিঞ্জিরাতেই ছিলেন। এর মধ্যে তারা মো. রেজওয়ান আলীর কোন খবর পাননি যে, তিনি বেঁচে আছেন কি-না! এদিকে যুদ্ধকালীন সময়ে এতগুলো ছেলে-মেয়েকে নিয়ে মফিজা খাতুনকে বহু কষ্ট করে সংসার চালাতে হয়েছিল। সে সময় তাঁর ছোট সন্তানের বয়স ছিল মাত্র দুই থেকে আড়াই বছর। একাত্তরের ২ এপ্রিল পাকহানাদার বাহিনী জিঞ্জিরা গ্রামে আক্রমণ চালায় এবং বহু মানুষকে হত্যা করে। সৌভাগ্যক্রমে সন্তানসহ বেঁচে যান মফিজা খাতুন। যুদ্ধ শেষ হবার মাস দুয়েক পর অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে বা মার্চের শুরুতে মফিজা খাতুন মিরপুরে ফিরে আসেন এবং দেখেন তাদের বাড়ি তখন বিহারিরা দখল করেছে আর বাড়ির মালামাল সব লুট করে নিয়ে গেছে। তিনি তখন ৬ নম্বর সেকশনের এ ব্লকে অবস্থিত একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে কোনরকমে আশ্রয় নেন। মো. রেজওয়ান আলীর ছেলেরা তার বাবার খোঁজে বের হন। তারা এলাকার পূর্ব-পরিচিত বিহারিদের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, তারা মো. রেজওয়ান আলী–কে শেষ দেখতে পেরেছিলেন একাত্তরের ২ এপ্রিল আনুমানিক দুপুর তিনটার দিকে তাদের বাসায়। এরপর তাঁকে আর তারা দেখেনি। ২ এপ্রিলই পাকসেনা ও বিহারিরা তাদের বাবাকে ধরে নিয়ে যায় এবং মিরপুর ১১ নম্বর সেকশন সংলগ্ন ব্রিজের নিকট তাঁকে হত্যা করা হয় বলে তারা ধারণা করেন। কারণ এই ব্রিজের আশেপাশে বহু বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছিল বলে জানা যায়। জল্লাদখানা সংলগ্ন মাঠ ও মাঠের আশেপাশের ডোবাতে বহু বাঙালিকে হত্যা করে লাশ ফেলে রাখতো বিহারিরা। অনেক সময় লাশ জল্লাদখানার কুয়োতে নিয়ে তারা ফেলেছে, যাতে লাশ পচার গন্ধ না ছড়ায়। এভাবে ১৯৭১ সালে হাজারো শহিদের লাশে পূর্ণ হয়েছিলো জল্লাদখানার কুয়া। শহিদ শ্বশুরের ঘটনা নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের সামনে স্মৃতিচারণ করতে পেরে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন মনোয়ারা বেগম মিনি। এই উদ্যোগের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতি তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের এই আত্মত্যাগকে সকলে শ্রদ্ধার সাথে যেন স্মরণ করি এই আশা ব্যক্ত করেন। কর্মসূচি শেষে মন্তব্য খাতায় নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী মায়া আক্তার লেখে, ‘মহান শহিদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি। তাঁদের এই আত্মত্যাগেই আমরা পেয়েছি আমাদের বাংলা। এই জল্লাদখানায় এসে অনেক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পেরে আমার খুবই ভালো লাগছে। সকল শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।’ স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. আবু জাফর লেখেন ‘শ্রদ্ধা ও বিনম্রতা সবসময়ই রয়েছে প্রিয় শহিদদের প্রতি। যাঁদের জীবনের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন দেশ। বধ্যভূমি আসার কারণে আমার প্রিয় শিক্ষার্থীদের চোখে মুখে ভেসে উঠেছে স্বাধীনতার আনন্দ।’ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে তিনি ধন্যবাদ জানান এই কর্মসূচি আয়োজনের জন্য। এই কর্মসূচি যেন চলমান থাকে সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি।

প্রমিলা বিশ্বাস
সুপারভাইজার, জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

ট্রাস্টি স্থপতি রবিউল হুসাইন স্মরণ অনুষ্ঠান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণে রবিউল হুসাইনের ভূমিকা স্মরণ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক বলেন, মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা থেকে শুরু করে সেগুনবাগিচার সাবেকি বাড়িটিকে জাদুঘর উপযোগী করার ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। এছাড়াও আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বর্তমান স্থাপনার জমি নির্বাচন, পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন এবং নির্মাণ প্রক্রিয়ায় রবিউল হুসাইন ও স্থপতি সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ্য করেন মফিদুল হক।

স্মরণ অনুষ্ঠানে অনান্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য প্রদান করেন স্থপতি কাজী গোলাম নাসির, স্থপতি ফারহানা শারমীন ইমু এবং প্রকৌশলী খুরশীদ বাহার। অনুষ্ঠানের সূচনাতে সঙ্গীত-শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন ছায়ানটের সাধারণ সম্পাদক শিল্পী লাইসা আহমেদ লিসা। রবিউল হুসাইনের কবিতা পাঠ করেন স্থপতি কাজী এম আরিফ ও স্থপতি রাফি উদ্দিন মাহমুদ। নৃত্য পরিবেশন করেন স্থপতি তামান্না রহমান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে রবিউল হুসাইনের জীবনী নির্ভর প্রামাণ্য চিত্র ‘কথোকথন’ প্রদর্শিত হয়।

সমাপনী বক্তব্যে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের সভাপতি স্থপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ বলেন, রবিউল ভাইয়ের সুযোগ ছিলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভবনটির নকশা নিজে করবার; কিন্তু তিনি নিজেকে সংযত রেখে তরুণদের সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন এটি হোক বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকর্মগুলোর একটি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভবনে রবিউল ভাইয়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায় উল্লেখ্য করে তিনি বলেন, এই ভবনে এলে তৎকালীন ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব জিয়াউদ্দিন তারিক আলী ও মেজর জেনারেল আমিন আহমেদ চৌধুরীর কথা মনে পড়ে। আমি, তারিক আলী ভাই ও আমিন আহমেদ চৌধুরী কারিগরী কমিটির সদস্য ছিলাম। স্থাপত্য নিয়ে রবিউল হুসাইনের লেখাগুলো সংকলিত করে গ্রন্থ আকারে প্রকাশের আশাবাদ ব্যাক্ত করেন আবু সাঈদ।

মূল অনুষ্ঠানের আগে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মিলনায়তনের সামনের লবিতে ‘রবিউল হুসাইন জীবন ও শিল্পচর্চা’ শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্থপতি ইনস্টিটিউটের সাবেক সভাপতি স্থপতি কাজী গোলাম নাসির। সংক্ষিপ্ত এই প্রদর্শনীতে রবিউল হুসাইনের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকর্মের পাশাপাশি তাঁর ব্যাক্তি ও সাহিত্যিক জীবন তুলে ধরা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন স্থপতি সামিয়া শারমীন বিভা।

মির্জা মাহমুদ আহমেদ
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

রোকেয়ার উদ্দেশ্য ছিল সম্ভাবনার একটি জানালা খুলে দেওয়া

– পল্লব বেপারী

('সুলতানার স্বপ্ন : শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল পাঠ' দ্বিতীয় পর্যায়ে পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় অরণি পাঠাগারের পক্ষে স্বরূপকাঠী পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীর এই লেখাটি জুরি বোর্ডের বিবেচনায় সেরা ১০-এ নির্বাচিত)

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের 'সুলতানার স্বপ্ন' একটি স্বল্প পরিসরের কল্পকাহিনি হলেও এর ভাবনার ব্যপ্তি বিশাল। গল্পটি পড়তে পড়তে মনে হয় এটি কেবল একটি স্বপ্নের দেশ নয় বরং সমাজের বাস্তব অসাম্যকে উল্টে দেখার এক সাহসী সাহিত্যিক প্রয়াস। ১৯০৫ সালে রচিত এই রচনায় রোকেয়া যে দৃষ্টিভঙ্গি হাজির করেন তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

গল্পের কাঠামোতে স্বপ্নের বর্ণনাকারী হঠাৎই প্রবেশ করে 'লেডিল্যান্ড' বা 'নারীস্থান'-এ, যেখানে নারীরাই রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা করে এবং পুরুষেরা গৃহকোণে সীমাবদ্ধ। এই উল্টো বিন্যাস প্রথমে কৌতুকময় মনে হলেও দ্রুতই এটি তীক্ষ্ণ সামাজিক সমালোচনায় রূপ নেয়। রোকেয়া দেখান, যে কাজগুলোকে আমরা স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছি– নারীর গৃহবন্দীত্ব, শিক্ষা ও ক্ষমতা থেকে বঞ্চনা, সেগুলো আদৌ প্রাকৃতিক নয়, বরং সামাজিক নির্মাণ। লেডিল্যান্ডে সেই নির্মাণ উল্টে দিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'ক্ষমতা যদি নারীর হাতে থাকে, সমাজ কি বিশৃঙ্খল হবে? তাঁর উত্তর- 'না, বরং হবে শান্ত, বিজ্ঞানমনস্ক ও মানবিক।'

গল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো বিজ্ঞান ও যুক্তিবোধের ব্যবহার। সৌরশক্তি, পরিছন্ন নগরব্যবস্থা, অপরাধহীন সমাজ, এসব উপাদান কল্পবিজ্ঞানের রূপক হলেও আসলে যুক্তিনির্ভর আধুনিকতার প্রতীক। রোকেয়ার কাছে নারীর মুক্তি আবেগের বিষয় নয়– এটি জ্ঞান, শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে কেবল নারীবাদী লেখক নয়, এক প্রগতিশীল চিন্তাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। লেডিল্যান্ডের শাসনব্যবস্থায় যুদ্ধ, হিংসা বা অধিপত্যের প্রবণতা নেই। এটি রোকেয়ার মানবিক আদর্শের প্রতিফলন। তিনি ইঙ্গিত দেন, ক্ষমতার কাঠামো বদলালে মূল্যবোধও বদলাতে পারে। এখানে নারীর নেতৃত্ব মানে পুরুষের অবমাননা নয় বরং সহাবস্থানের নতুন নৈতিকতা। এই কারণে গল্পটি প্রতিশোধমূলক নারীবাদের বদলে ন্যায়ভিত্তিক সমতার কথা বলে।

পল্লব বেপারীর পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন অরণি পাঠাগারের সভাপতি ধীরেন হালদার

ভাষা ও ভঙ্গিতে সরলতা থাকলেও ব্যঞ্জনা গভীর। সংলাপের মধ্যে দিয়ে সমাজের প্রচলিত যুক্তিগুলোকে রোকেয়া নীরবে ভেঙে দেন। যেমন, নারীর দুর্বলতাকে তিনি প্রাকৃতিক নয়, সামাজিক ফল বলে দেখান। আবার গৃহবন্দিত্বের মতো প্রথাকে তিনি নিরাপত্তার অজুহাত নয়, ক্ষমতার কৌশল হিসেবে উন্মোচন করেন। এই সূক্ষ্মতা গল্পের পাঠকে ভাবনার দিকে ঠেলে– আমরা যা স্বাভাবিক বলে মানি, তা কি সত্যিই ন্যায্য?

পাঠকের চোখে লেডিল্যান্ড কিছুটা আদর্শায়িত মনে হতে পারে। বাস্তব সমাজের জটিলতা শ্রেণি বা অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব এখানে কম প্রতিফলিত। কিন্তু এটি গল্পের সীমাবদ্ধতা নয়, বরং ইউটোপিয়ান ধারার বৈশিষ্ট্য। রোকেয়ার উদ্দেশ্য ছিল নিখুঁত রাষ্ট্র নির্মাণ নয় বরং সম্ভাবনার একটি জানালা খুলে দেওয়া যাতে পাঠক বর্তমান সমাজকে নতুন চোখে দেখতে পারে।

ব্যক্তিগতভাবে সুলতানার স্বপ্ন আমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয় এর প্রাসঙ্গিকতায়। শত বছর পেরিয়ে নারীর শিক্ষা, নিরাপত্তা, সিদ্ধান্ত নেওয়া– এই প্রশ্নগুলো এখনো তীব্র। রোকেয়া দেখিয়েছেন, পরিবর্তন কেবল আইন দিয়ে নয়, চিন্তার কাঠামো দিয়ে বদলাতে হয়। তাঁর কল্পনা আমাদের বাস্তবকে আয়নার সামনে দাঁড় করায়– 'আমরা কি সত্যিই সমতার পথে এগোচ্ছি?'

শেষে বলা যায়, 'সুলতানার স্বপ্ন' একটি ছোট রচনা হয়েও প্রশ্ন তোলে। এটি কল্পবিজ্ঞান, নারীবাদ ও সামাজিক সমালোচনার এক অনন্য মেলবন্ধন। রোকেয়ার স্বপ্ন কেবল সাহিত্যিক কৌতুক নয়, এটি একটি নৈতিক আহ্বান- যুক্তি, শিক্ষা ও মানবিকতার ভিত্তিতে সমাজকে পুনর্গঠনের আহ্বান।

স্বরূপকাঠী পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১০ম শ্রেণি, রোল : ৩

সাংবাদিক মার্ক টালি স্মরণানুষ্ঠান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তারা একটি খবরও দেখাতে পারেনি।'

ডা. সারওয়ার আলী বলেন, এই অনুষ্ঠান কেবল মার্ক টালিকে স্মরণ করার জন্য নয় বরং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যও। তিনি উল্লেখ করেন যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক সাংবাদিকরা সত্য তুলে ধরেছিলেন, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেয়। তিনি বলেন- 'গণহত্যার যে নৃশংসতা, ভয়াবহতা এবং ব্যাপকতা, এটি মার্ক টালিই তুলে ধরেছিলেন'। ড. আলী মানবাধিকার ও সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতার গুরুত্বের ওপর জোর দেন এবং বলেন যে, সাংবাদিকদের কাজ হলো সত্যকে তুলে ধরা, পক্ষ নেওয়া নয়।

৭১ টিভির সাংবাদিক শাহনাজ শামরিন তার আবেগঘন বক্তব্যে বলেন, মার্ক টালি শুধু একজন সাংবাদিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ইতিহাসের নৈতিক সাক্ষী। তার প্রতিবেদনে পুড়িয়ে দেওয়া গ্রাম, নীরব মানুষের ভয় সবই উঠে এসেছে। তিনি বলেন, 'মার্ক টালি আমাদের মনে করিয়ে দেন, সত্যকে বলতে হবে, যতই নীরবতা ও ভয় ঘিরে থাকুক না কেন।' তিনি আরও উল্লেখ করেন যে টালির সাহসী প্রতিবেদন আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সাবির মুস্তাফা টালির কাজের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, টালির প্রতিবেদন বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে তুলে ধরেছিল এবং পাকিস্তানি প্রচারণাকে প্রতিহত করেছিল। তিনি উল্লেখ করেন 'মার্ক টালির প্রতিবেদন শুধু তথ্য নয়, এটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের দলিল। তাঁর কাজ আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকে দৃশ্যমান করেছে... সত্যকে তুলে ধরার সাহসই সাংবাদিকতার মূল শক্তি। মার্ক টালি সেই শক্তির প্রতীক।'

প্রবীণ সাংবাদিক ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসবিদ হারুন হাবীব সাংবাদিকতার দায়িত্ব ও সাহসিকতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, টালির মতো সাংবাদিকরা মুক্তিযুদ্ধের সময় সত্যকে তুলে ধরেছিলেন, যা আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকে দৃশ্যমান করে তোলে। তিনি উল্লেখ করেন 'সাংবাদিকতার কাজ হলো সত্যকে প্রকাশ করা, যতই চাপ বা ভয় থাকুক না কেন, মার্ক টালি সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন।' হারুন হাবীব আরও বলেন, টালির প্রতিবেদন শুধু তথ্য নয় বরং মানবতার প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক টালির অবদানকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, টালির কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আন্তর্জাতিকভাবে নথিভুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি বলেন, 'মার্ক টালির প্রতিবেদন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দলিল। তাঁর সাহসী সাংবাদিকতা ছাড়া অনেক সত্য হয়তো আজ হারিয়ে যেত।' মফিদুল হক আরও উল্লেখ করেন যে, 'সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের প্রশ্নে টালির কাজ আজও প্রাসঙ্গিক।'

স্মরণসভাটি ছিল একদিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি, অন্যদিকে সাংবাদিকতার নৈতিকতার পাঠ। মার্ক টালির উত্তরাধিকার কেবল তাঁর প্রতিবেদনেই নয়, তাঁর বিশ্বাসে নিহিত 'আমরা এখানে সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে এসেছি'। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এই আয়োজন নিশ্চিত করেছে যে তাঁর অবদান ভবিষ্যৎ সাংবাদিক, ইতিহাসবিদ ও মানবাধিকারকর্মীদের জন্য চিরকাল অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

সাবরিনা আফরীন তন্বি
গবেষণা সহকারী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

নানান ভাষার কবিতা পাঠে উদ্‌যাপিত হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি...। একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে আর দশটা সাধারণ দিন থেকে অনেক বেশি আবেগঘন, আনন্দ-বেদনার দিন। পৃথিবীর ইতিহাসে কত বীর প্রাণ দিয়েছে স্বাধিকারের আশায় কিন্তু মাতৃ ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন বিরলতম ঘটনা। সালাম-বরকত-রফিক-জব্বারের প্রাণের বিনিময়ে আজ আমরা প্রাণ খুলে বাংলায় মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি। প্রতিবছরের মতো এবারও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বাংলার পাশাপাশি ১৫টি ভাষার কবিতা পাঠের আয়োজন করা হয়। মারমা, গারো কিংবা মণিপুরি। ভাষা আলাদা হলেও অনুভূতি একই লয়ে, তালে, ছন্দে হৃদয়ে এসে নাড়া দিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উন্মুক্ত চত্বরে গান, কবিতা ও বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালা নিয়ে প্রদর্শনীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বাঁশির সুরে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের পরিবেশনায়। 'আমি বাংলায় গান গাই' সঙ্গীত-শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকর্মী শিল্পী প্রমিলা বিশ্বাস।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম বলেন, 'এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা মূলত ভাষার বৈচিত্র্য তুলে ধরছি। বাংলা ও বাংলাদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা এবং বিদেশি ভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে প্রতিবছরের ধারাবাহিকতায় এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।'

অনুষ্ঠানে মারমা ভাষার কবিতা 'নৈরাসীহ্ টাইংখুংলাহ' কবিতা আবৃত্তি করেন মংহাই নু মারমা। সাদ্রি ভাষায় রচিত '২১ ফেব্রুয়ারি' কবিতাটি আবৃত্তি করেন সাথী তির্কী। গারো জনগোষ্ঠীর মান্দি ভাষায় রচিত 'নাংখো খাসারা সালাম ও নিথুগিপা' পাঠ করেন মতেন্দ্র মানকিন। রুমিতা সিনহা আবৃত্তি করেন মনিপুরি ভাষার কবিতা 'লালগৌগী ব্রী'। হাজং ভাষায় 'আমারো নি থামে' আবৃত্তি করেন টুম্পা হাজং। চাকমা ভাষায় 'উঃম লুলোঙ' আবৃত্তি করেন রমিতা চাকমা; খেয়াং ভাষায় 'উলুং-অং ক্যহ্ আ-সা-ম' আবৃত্তি করেন অংক্রাথুই খেয়াং; মাহাতো ভাষায় 'একলে হাটব' আবৃত্তি করেন পলাশ কুমার মাহাতো ও ম্রো ভাষায় 'আকম আক্তাত ছুং' আবৃত্তি করেন সং ক্রাত ম্রো।

এছাড়া ইংরেজি ভাষায় রচিত কবি রবার্ট ফ্রস্টের 'স্টপিং বাই উডস অন আ স্নো ইভিনিং' কবিতা আবৃত্তি করেন আবৃত্তিশিল্পী তামান্না সারোয়ার নীপা। ফরাসি ভাষায় রচিত শার্লস বোদলেয়ারের 'করেসপন্ডেন্স, লেস ফ্লুরস দে মাল' পাঠ করেন হোসাইন মাহমুদ, চীনা ভাষায় রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন অনিকা আক্তার যার বাংলা অর্থ 'আমি এই ভূমিকে ভালোবাসি'। ককবরক ভাষার কবিতা 'খাকসোমা' আবৃত্তি করেন সাগর ত্রিপুরা; সানতাল ভাষায় রচিত 'মিত টেন গোগো দন' আবৃত্তি করেন আদিত্য মার্ডী। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ভাষার কবিতার বাংলা অনুবাদ এবং বাংলা ভাষায় রচিত কবিতা আবৃত্তি করেন বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পীরা ।

ইয়াছমিন লিসা
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

পুনর্কল্পনায় সুলতানার স্বপ্ন প্রদর্শনীর মন্তব্য খাতা থেকে

Sultana's Dream – what a pleasure to feel this text interpreted my artists and fellow dreamers. Many thanks to Sharmillie, the museum and the artists for this powerful medifution as possibilities and dreams!
An amazing exhibition –

Maaya Rehna
British Council, January '26

Visiting the Liberation War Museum really touched my heart. The sacrifice of the martyrs and the courage of the freedom fighters came alive before my eyes. Coming here I experienced the history of the country in a new way. Everyone should come at least once.

Samik Redoy
Anwer Khan Modern University
16.01.26

সুলতানার স্বপ্ন প্রদর্শনী আয়োজিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সুলতানার স্বপ্ন প্রদর্শনী খুব ভালো একটা প্রদর্শনী। যা মানব সমাজে ব্যাপক একটা কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। সুলতানার স্বপ্ন আসলে একটা বাঙালির জীবনের সাথে খুব নিবিড়ভাবে সাদৃশ্যমান। যা মানুষের দৈহিক কার্যকলাপ এবং সম্পর্কের সাথে অটুট থাকে। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জীবনে এক কঠিন সংগ্রামের পথ নিয়ে সুলতানার স্বপ্ন বাস্তবে তা রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছিলেন। পরে তা বাস্তবে জীবনের প্রলোভন দেখিয়েছে। সুতরাং এককথায় সুলতানার স্বপ্ন আয়োজিত প্রদর্শনীটি বাঙালির জীবনে এক সঠিক পথ বেছে নিয়ে আসবে এই প্রত্যাশাই করি। অতএব, যারা এই প্রদর্শনীটি খুব দৃঢ়ভাবে খুব পরিশ্রম করে আয়োজন করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ।

Thanks for Liberation War Museum and Kalakendro.
Bikas, Chunarughat, Hobiganj
30. 01. 2026

I was truly inspired and moved by the exhibit. Very heartening to see that the dream and imagination is continuing through generations. The lordness and satire of the different exhibits a portray Rokeya's Sultana's Dream spirits. Many more people need to see this exhibit and carry the messages in their hearts and spread them. A truly courageous and very timely initiative.

Rounaq Jahan
Political Scientist, Author and Distinguished Fellow CPD
January 31, 2026

অসাধারণ... এমন কিছু আমি অনেকদিন পরে দেখলাম। শিল্পীদের জন্য রইলো শুভকামনা।

রিজওয়ান করিম
সিনিয়র সাংবাদিক,দৈনিক জনকণ্ঠ
৬.১২.২৫

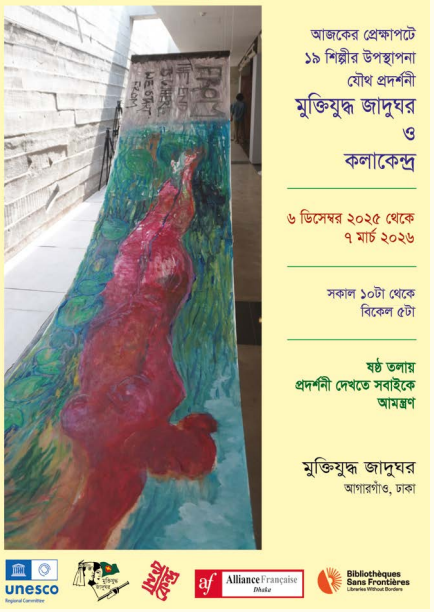

অসাধারণ প্রতিটি কাজ... প্রত্যেকটি স্বপ্ন।

আমরা প্রত্যাশা করি কোন একদিন আমাদের সব স্বপ্ন পূরণ হবে।

নাজমুন নাহার
কলাবাগান
৬.১২.২০২৫

শিক্ষার্থীদের সংগৃহীত প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য

দেশকে স্বাধীন করতে হবে, মরতে হলে মরবো

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভে ২০০৪ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের সংগৃহীত 'মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীভাষ্য' সংগৃহীত হচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে জাদুঘরের এই উদ্যোগ ও আহ্বানে সাড়া দিয়ে শিক্ষার্থীরা একাত্তরের প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতি-ভাষ্য লিখে পাঠায়। এসকল লেখায় উঠে আসে মুক্তিযুদ্ধের অজানা ইতিহাসের নানা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষার্থীদের পাঠানো সেসব ভাষ্য থেকে কিছু নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে জাদুঘর বার্তায়।

আমি আমার নানু শেফালী বেগমের কাছে একদিন জানতে চাইলাম আমার নানা শহীদ কাজী মোজাম্মেল হক সম্পর্কে। তিনি কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেন এবং কীভাবে শহীদ হলেন। নানু আমাকে বললেন, তোমার নানা যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় খুলনা থেকে পায়ে হেঁটে আমার বাবার বাড়ি উজিরপুর থানার আটিপাড়া গ্রামে আসেন এবং তখন আমি আমার বাবার বাড়িতেই অবস্থান করছিলাম। তখন পর্যন্ত আমার মায়ের জন্ম হয়নি বলে নানু জানান। ওখানে অবস্থান করার সময় গোপনে মুক্তিযোদ্ধা তৈরির কাজ শুরু করেন নানা। নানুকে নানা কিছুই বলতেন না। আমার নানার সাথী মুক্তিযোদ্ধারা সৈয়দ মকবুল (হস্তিশুণ্ড নিবাসী) এবং তৎকালীন সেনাবাহিনীর সদস্য আলী আশ্রব জামাদ্দার (সানুহার নিবাসী) ২টি রাইফেল নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের কাজে বের হতেন। নানু তাদের নিষেধও করতেন কিন্তু তারা বলতেন, 'দেশেকে স্বাধীন করতে হবে, মরতে হলে মরবো।' পরবর্তীকালে নানুকে নিয়ে আমার নানা তার নিজ গ্রাম বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার চাঙ্গুরিয়া গ্রামে আসেন। সেখানে আসার পর এলাকার কিছু লোক তার কাছে আসেন এবং বলেন, আপনি আর্মির লোক, আপনি আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিবেন। তারপর থেকে নানা নারায়ণপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিতেন। তখনও তিনি বাড়ি ছেড়ে যুদ্ধে যাননি। হঠাৎ একদিন পশ্চিমা হানাদার বাহিনী গানবোটে করে গুঠিয়া এসে নামে।

এরপর গণহত্যা করতে করতে চাঙ্গুরিয়া গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, কাজী মোজাম্মেল হকের বাড়ি কোন দিকে? ইতিমধ্যে নানাজান বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়েন এবং হানাদার বাহিনীর সম্মুখে পড়ে যান। দূর থেকে অনেকেই দেখেছেন তার দিকে রাইফেল তাক করে আছে। নানু বললেন যে, আমার নানা উর্দু বলতে জানতেন এবং তার কাছেও কাজী মোজাম্মেল হকের বাড়ির কথা জানতে চান। নানা উর্দুতে বললেন যে, সামনের দিকে একটু গেলেই পাবেন। এ সময় হানাদার বাহিনী অনেককে গুলি করে হত্যা করে। হানাদাররা চলে যাবার পর আমার নানা কিছু ঔষধপত্রসহ আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য বের হন। তার বাড়ির পাশের ফকির বাড়ির একজনের পেটের নাড়িভুড়ি বের হয়ে গিয়েছিলো। নানা তার নাড়িভুড়ি পেটের মধ্যে ঠেলে দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে লোকটি মারা যান। এরকম অসংখ্য লোক সেদিন গণহত্যার শিকার হয়েছেন। এরপর নানু বলেন যে, এ সময় আমার মায়ের বয়স এক মাসের মতো হয়েছে। সেই গণহত্যার রাতে নানা নানুকে বললেন, 'আজই আমার মৃত্যু হতো, আমাকে মারার জন্যই তো ওরা এসেছিলো, কারণ আমি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেই। আল্লাহই আমাকে বাঁচিয়েছেন। কালই আমি যুদ্ধে যাবো। নানু অনেক অনুনয়-বিনয় করে নানাকে তার দেড় বছরের ছেলে ও এক মাসের মেয়ে রেখে যেতে নিষেধ করলেন। বললেন, 'আমি একা কি করে থাকবো?' আমার নানার মা তখনও জীবিত ছিলেন। নানা তার মাকে বললেন 'তুমি এই পাগলীকে বোঝাও ও যেনো আমাকে যুদ্ধে যেতে বাধা না দেয়, তুমি ওকে ফেরাও। ওদের দেখে রেখ।' তারপর নানা যুদ্ধে চলে যান এবং বানারীপাড়ার আলতা গ্রামের চৌধুরীবাড়ির ক্যাম্পের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। কিছুদিন পর স্বরূপকাঠির বানারীপাড়ায় গানবোটে করে আক্রমণ চালায় পশ্চিমা হানাদার বাহিনী। তখন তাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধেই নানা শহিদ হন। কেউ কিছু জানে না। হঠাৎ একদিন মুক্তিযোদ্ধারা একটি লাশ নিয়ে বাড়ি এলো। তখন ছিলো ভাদ্র মাস, চারদিকে পানি থৈ থৈ। মাটি উঁচু করে তাকে দাফন করে গেলো। আমার নানার সহযোদ্ধারা ছিলো ক্যাপ্টেন ওমর বীর উত্তম, আগরপুরের এম এ হক বীর বিক্রম, কাজীরচরের মালেক মিলিটারি এবং আরও স্থানীয় কয়েকজন। তারপর আমার নানু তার বাবার আশ্রয়ে উজিরপুর থানার আটিপাড়া গ্রামে চলে যান এবং তার দেড় বছরের ছেলে ও এক মাসের মেয়ে– আমার মাকে নিয়ে দিন অতিবাহিত করে আর একটি জীবন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি তার ছেলেমেয়েদের যথাযথভাবে সুশিক্ষিত করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্তমানে তার ছেলে বিএন খান ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক এবং মেয়ে অর্থাৎ আমার মাও পাস করেছেন এবং তার জামাতা অর্থাৎ আমার বাবাও কলেজের একজন সহকারী অধ্যাপক। আর এসকল কিছুই আমার নানুর কষ্টের ফসল। নানুর কাছে এখনো নানার রক্তমাখা জামাটি সংরক্ষিত আছে। নানু বলেন, 'আমি শহীদের স্ত্রী হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে করছি।' আর আমিও একজন শহিদের নাতি হিসেবে গৌরবান্বিত বোধ করছি।

উপজেলার সামনে স্মৃতিফলকে আমার নানার নাম আছে। স্মৃতিফলকটির পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় নানার কথা খুব মনে পড়ে, যদিও তাকে দেখিনি। কিন্তু তিনি তো দেশমাতৃকার জন্যেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, একথা ভেবে গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে।

সূত্র: জ- ১৪৮৫৪

সংগ্রহকারী:
সৈয়দ মাইদুল ইসলাম
ডব্লিউ.বি.ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন
১০ম শ্রেণি, বিজ্ঞান শাখা

বর্ণনাকারী:
শেফালী বেগম, স্বামী: শহীদ মোজাম্মেল হক
আটিপাড়া, উজিরপুর, জেলা : বরিশাল
সম্পর্ক : নানী

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আর্কাইভে যুক্ত হলো কণ্ঠযোদ্ধা শাহীন সামাদ-এর হারমোনিয়াম

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণের ধারাবাহিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে কণ্ঠযোদ্ধা শাহীন সামাদ-এর ব্যবহৃত একটি হারমোনিয়াম স্মারক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভ যুক্ত হয়েছে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ স্মারকটি গ্রহণ করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে ব্যবহৃত এই হারমোনিয়ামটি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারক হিসেবে বিবেচিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় শিল্পীদের সঙ্গীত মানুষের মনোবল জাগ্রত করতে এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল, এই হারমোনিয়ামটি সেই ইতিহাসের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত।

শাহীন সামাদ ছিলেন মুক্তিযুদ্ধকালীন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম অগ্রসৈনিক। তিনি কলকাতার ১৪৪ লেনিন সরণিতে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থার সক্রিয় সদস্য এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখেন। তাঁর কণ্ঠ ও সঙ্গীত মুক্তিযোদ্ধা এবং সাধারণ মানুষের মাঝে স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রয়াত চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ পরিচালিত প্রামাণ্যচিত্র 'মুক্তির গান'-এ দেখা যায়, ট্রাকে বসে এই হারমোনিয়াম বাজিয়ে ক্লাসিক্যাল সংগীত শেখাচ্ছেন শিল্পী বিপুল ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানে শাহীন সামাদ এই হারমোনিয়াম বাজিয়ে গুরুসদয় দত্ত'র কথা ও সুরে ব্রতচারী গান-বাংলা মার দুর্নিবার আমরা তরুণ দল... পরিবেশন করেন। গান পরিবেশনের সময় জাদুঘরের কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কণ্ঠ মেলান এবং আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

ঐতিহাসিক স্মারক গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন জাদুঘরের নির্বাহী কর্মকর্তা নাসেহুন আমীন, কিউরেটর আমেনা খাতুন, সহযোগী ব্যবস্থাপক (হিসাব) মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন, অডিও-ভিজ্যুয়াল কর্মকর্তা শরীফ রেজা মাহমুদ, আর্কাইভ কর্মকর্তা মন্টু বাবু সরকারসহ জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

এই ঐতিহাসিক স্মারকটি সংযোজনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংগ্রহভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ হলো।

– মন্টু বাবু সরকার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা | ষষ্ঠ বর্ষ, দশম সংখ্যা, মার্চ ২০২৬

শুরু হলো ‘আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ’-এর চতুর্থ আয়োজন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত ‘সুলতানার স্বপ্ন’ গ্রন্থপাঠ-এর সমাপনী উৎসবে সূচিত হলো ‘আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ’-এর চতুর্থ আয়োজন। নির্বাচিত গ্রন্থাগারের মধ্যে বই বিতরণের মাধ্যমে সূচনা ঘটে এই আয়োজনের। একাত্তরের কণ্ঠযোদ্ধা, বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও নাট্যজন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি প্রয়াত আলী যাকের-এর স্মৃতি বহমান রাখতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গৃহীত আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ শুরু হয় ২০২১ সালে। উদ্যোগ বাস্তবায়নে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতি। ঢাকা মহানগরসহ বিভিন্ন জেলার ৫০টি বেসরকারি পাঠাগারকে সম্পৃক্ত করে পরিচালিত হয় এই উদ্যোগ। এবারের আয়োজনে দুই বিভাগে শিক্ষার্থীরা পাঠ উদ্যোগে অংশ নিবে ক. স্কুল পর্যায় খ. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিটি গ্রন্থাগারে নির্বাচিত দু’টি বইয়ের পাঁচ কপি করে প্রদান করে। নির্বাচিত গ্রন্থসমূহ: স্কুল-পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য হুমায়ূন আহমেদ রচিত ‘অনিল বাগচীর একদিন’ এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কথা সাহিত্যিক মাহমুদুল হক-এর খেলাঘর।

জাতীয়ভাবে পরিচিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত বিচারকগণ পাঠ-প্রতিক্রিয়ার মধ্য থেকে প্রতি বিভাগে সেরা দশ রচনাকে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করবেন। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক পাঠককে সনদ প্রদান করা হবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রত্যাশা সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বিগত বছরের মতো এবছরেও ‘আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ’ সফল হবে এবং একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শিল্পী যে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন সেই নবীন প্রজন্ম গঠনে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হবে।

গ্রন্থাগারে নতুন সংযুক্তি

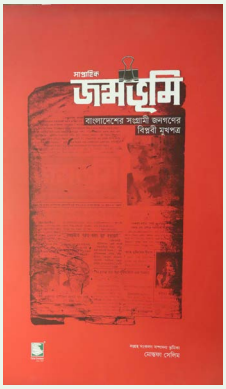

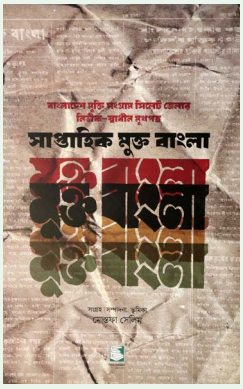

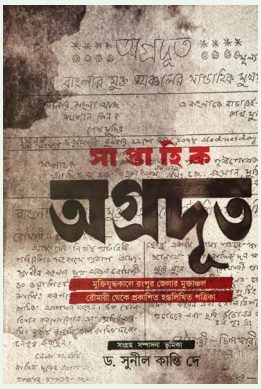

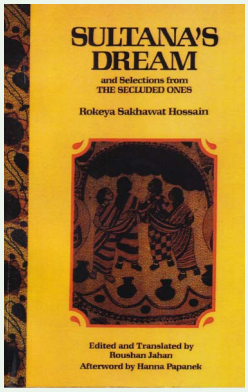

মুক্তিযুদ্ধকালে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত সংকলন ‘জন্মভূমি’, ‘মুক্ত বাংলা’ ও ‘অগ্রদূত’ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদান করেন পাঠক সমাবেশ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শহীদুল ইসলাম বিজু এবং The Feminist Press at the City University of New York প্রকাশিত এবং রওশন জাহান সম্পাদিত Sultana’s Dream : and Selection from the Secluded ones : Rokeya Sakhawat Hossain গ্রন্থটি অধ্যাপক রওনক জাহান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের জন্য প্রদান করেন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ অতিথি

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পাকিস্তান থেকে আগত গবেষক Maryam S Khan ও তার সহকারী গবেষক Adnan Bajwa মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন এবং ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

অমর একুশে গ্রন্থমেলায় পরিদর্শন করুন
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্টল
স্টল নং ৪৪৭-৪৪৮
(বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গন)

আগামীর আয়োজন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে চলচ্চিত্র, আলোচনা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৬ মার্চ শনিবার বিকেল চারটায়। সকলে সপরিবার, সবান্ধব আমন্ত্রিত।

সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস Learning from Genocide towards Peace and Justice বিষয়ক সপ্তাহব্যাপী আবাসিক স্কুল অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৫ এপ্রিল থেকে ১ মে। আবেদন করতে স্ক্যান করুন

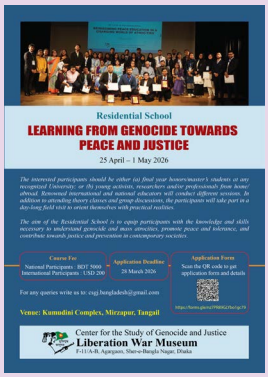

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে মফিদুল হক, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম, গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩,
ইমেইল: mukti.jadughar@gmail.com, ওয়েব: www.liberationwarmuseumbd.org, ফেসবুক: facebook.com/liberationwarmuseum.official